বাংলাদেশে শেখ ফরিদ

বাংলাদেশের জনজীবনে, কিংবদন্তিতে, লোকগাথা ও সংস্কৃতিতে শেখ ফরিদের উপস্থিতি নানাভাবে। চট্টগ্রাম শহরের একটি পুণ্যস্থান 'শেখ ফরিদের চশমা'। মানুষের বিশ্বাস, শেখ ফরিদ চট্টগ্রামের একটি পাহাড়ের চূড়ায় ৩৬ বছর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাধনা চলাকালে তার চোখের জল থেকে পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি হয় একটি কূপ বা চশমা, যা চট্টগ্রামবাসীর কাছে পরিচিত শেখ ফরিদের চশমা হিসেবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব দল-মতের মানুষ যান শেখ ফরিদের চশমায়। ভক্তিভরে পান করেন পানি। লাভ করেন প্রশান্তি...

প্রবাদেও আছেন শেখ ফরিদ। 'মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট' প্রচলিত প্রবাদটি বিভিন্ন বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিক ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা প্রবাদটি সম্পর্কে বলেন, প্রবাদে শেখ ফরিদ মানে সাধু দরবেশ। যে ব্যক্তি মুখে পীর-দরবেশের সঙ্গে কথা বলবে অথচ আচরণে ভিন্ন করবে, তাকে উদ্দেশ্য করে এ প্রবাদ বলা হয়। তিনি আরো বলেন, শেখ ফরিদ মানে পীর-দরবেশরা মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেন, প্রেমের কথা বলেন। তিনি আরো জানান, চট্টগ্রামের শেখ ফরিদের চশমা অনেকটা দরগার মতো। মানুষ সেখানে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে মানতসহকারে যায়। এ নিয়ে ড. মুহম্মদ এনামুল হক কিছু কাজ করেছিলেন। এরপর আর উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি।

শেখ ফরিদ মিশে আছেন বাংলাদেশে। ফরিদপুর নামকরণ হয়েছে বাবা শেখ ফরিদের নামে। আধুনিক ফরিদপুর গড়ে উঠেছে শেখ ফরিদের আস্তানাকে কেন্দ্র করে। জেলা প্রশাসন, আদালতসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ সব অফিস শেখ ফরিদের আস্তানার চারপাশে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, শেখ ফরিদ একটি বটগাছের নিচে অস্থায়ী আস্তানা গড়েছিলেন। এই স্থানটি পরবর্তীকালে 'শেখ ফরিদের আস্তানা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লোকমুখে মাঝে মধ্যে মাজার বা দরগা শব্দটিও উচ্চারিত হয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী শেখ ফরিদ সারা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। পরিভ্রমণের সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। এসব স্থান পরবর্তীকালে পরিচিতি পায় শেখ ফরিদের আস্তানা হিসেবে। ঢাকার কমলাপুরে আছে শেখ ফরিদের আস্তানা। আছে দিনাজপুরে, আছে মেহেরপুরে। আছে শেখ ফরিদকে নিয়ে শত শত মিথ। ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শেখ ফরিদকে নিয়ে ইতিহাস ও গবেষণা কম। কিন্তু মিথ প্রচুর। তাঁর জীবন নিয়ে মিথ, তাঁর আস্তানাগুলো নিয়ে মিথ।

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারের বিভিন্ন খন্ডে এসেছে শেখ ফরিদ প্রসঙ্গ। জেলা গেজেটিয়ার ফরিদপুরে বলা হয় শেখ ফরিদ (১২৬৫-জন্ম) একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। ফরিদপুর শহরে তিনি কিছু সময় অবস্থান করেন। চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ারে এ সম্পর্কে বলা হয়, শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন হয়তো। কে শেখ ফরিদ এ নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. মহম্মদ এনামুল হক। ড. হকের মতে, 'তিনি বিখ্যাত সাধক বাবা শয়খ্ ফরীদু-দ-দীন গনজ্-ই-শকর ব্যতিত আর কে?' ইতিহাস হইতে (যথা তারিখ-ই-ফিরিশতাহ, দ্বাদশ অধ্যায় আইন-ই-আকবরী, তধকিরহ্-ই-ঔলিয়া-ইহিন্দ) জানিতে পারা যায়, বাবা শয়খ ফরীদ, কাকীর শিষ্য ও নিজামের গুরু ছিলেন।'

শেখ ফরিদ মিশে আছেন বাংলাদেশে। ফরিদপুর নামকরণ হয়েছে বাবা শেখ ফরিদের নামে। আধুনিক ফরিদপুর গড়ে উঠেছে শেখ ফরিদের আস্তানাকে কেন্দ্র করে। জেলা প্রশাসন, আদালতসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ সব অফিস শেখ ফরিদের আস্তানার চারপাশে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, শেখ ফরিদ একটি বটগাছের নিচে অস্থায়ী আস্তানা গড়েছিলেন। এই স্থানটি পরবর্তীকালে 'শেখ ফরিদের আস্তানা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লোকমুখে মাঝে মধ্যে মাজার বা দরগা শব্দটিও উচ্চারিত হয়

ইতিহাস থেকে জানা যায়, শেখ ফরিদের গুরু ছিলেন বখতিয়ার কাকী। শেখ ফরিদ ছিলেন তার প্রধান শিষ্য। অন্যদিকে শেখ ফরিদের প্রধান শিষ্য ছিলেন কিংবদন্তিসম সাধু হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া। শেখ ফরিদ ছিলেন তেরো শতকের মানুষ। এক যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ। ভারতে তখন বর্ণ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, ব্রাক্ষণ্যবাদ প্রবল। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির না থাকায়। আঞ্চলিক রাজারা পরস্পর লিপ্ত থাকতো যুদ্ধে। সৃজনশীলতা হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। ১১৯৩ সালে মুহাম্মদ ঘুরির দিল্লি বিজয়ের মাধ্যমে শুরু হয় ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা।

তখন রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো সমাজের সৃজনশীলতা। এক যুগের অবসানে আরেক যুগের সূচনা হয়। নতুন সমাজ-সভ্যতার যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম শেখ ফরিদ। ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, কোনো কিছুই বাদ যায় না শেখ ফরিদের প্রভাব থেকে। রাজ ভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ফার্সি। সাধারণ মানুষের ভাষা উপেক্ষিতই থাকে। শেখ ফরিদ শুরু করেন আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখা। বিকাশ শুরু হয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার। ভারতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করে প্রচার করেন প্রেম-ভালোবাসা, প্রচার করেন ইসলাম। তার অনুসারীরা ছড়িয়ে যান

দরগার প্রান্তে বসে কতজনে অঝোরে কেঁদেছে চোখের পানি দিয়ে মনের গ্লানি ধুয়েমুছে ফেলার জন্য, কেঁদেছে অন্ধকার ভবিষ্যতে আলোর ইশারা পাবার জন্য। আশা পূর্ণ হবে কি অপূর্ণ থাকবে তা না ভেবে তৃপ্ত মন নিয়ে দরগা থেকে ফিরে গেছে সবাই। কতজনে মানত করেছে, সন্তান পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবজাতককে নিয়ে যাবে দরগায়, বাবা ফরিদের চরণধূলিমাখা দরগার মাটি লেপে দেবে তার কপালে। কতজন আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে দরগায় জ্বেলে দিয়েছে রঙিন মোমবাতি

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

শেখ ফরিদের স্মৃতিচিহ্নগুলো বাংলাদেশের মানুষের কাছে তীর্থস্থান। মানুষ আশ্রয় খুঁজে পায় শেখ ফরিদের স্মৃতি চিহ্নে গিয়ে। বাংলাদেশের জনমনে শেখ ফরিদের বিপুল প্রভাব সম্পর্কে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারে শেখ ফরিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বাংলাদেশের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেখ ফরিদকে নিয়ে বিভিন্ন মিথ বয়ে চলেন।

শেখ ফরিদের চেল্লা : আধুনিক ফরিদপুরের কেন্দ্রস্থল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত মোঃ আবদুস সাত্তারের লেখা 'ফরিদপুরে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়, 'ফরিদপুর জেলার মানুষ যে নামের রুহানী বরকতে ধন্য, আজও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনেকে বিপদে- আপদে যে নামের দোহাই দিয়ে শান্তির অন্বেষায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর'। গ্রন্থে আরো লেখা হয়, 'মধ্যযুগের প্রারম্ভে হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে এসে ফরিদপুর, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর এই মিশনারি কাজের ধরন ছিলো বিভিন্ন স্থানে তাঁবু গেড়ে নিজের সাধনার কাজে অগ্রসর এবং আগন্তুকদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়া। তাঁর এরূপ কাজের সন্ধান মিলে ফরিদপুর কোর্ট প্রাঙ্গণের শাহ ফরিদের দরগাহ নামীয় স্থানের জনশ্রুতি থেকে। তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এখানকার বটতলায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁবু গেড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন'।

৫০-এর দশক পর্যন্ত ফরিদপুরের শেখ ফরিদের আস্তানা বা শাহ ফরিদের দরগার এক ধরনের পরিবেশ ছিলো। ৬০-এর দশকে পাল্টে যায় পরিবেশ। অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন তার 'বাংলাদেশের সুফি সাধক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন মাজারের পরিবেশ, মিথ, মানুষের ওপর প্রভাব ইত্যাদি। তিনি সুফি সাধকদের নিয়ে জেলাভিত্তিক আলোচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি লেখেন, 'ফরিদপুর কালেক্টরেট এলাকা সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে শতাব্দীর পুরনো বটগাছের নিচে ফরিদ শাহের দরগাহ বা চেল্লা। এখানে সাধু-সজ্জন, পাপীতাপী, ধনী-গরিব, জরাব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো আসতো মনের শান্তির জন্যে।

ফরিদপুর কালেক্টরেট এলাকা সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে শতাব্দীর পুরনো বটগাছের নিচে ফরিদ শাহের দরগা বা চেল্লা। এখানে সাধু-সজ্জন, পাপী-তাপী, ধনী-গরিব জরাব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ-মহিলা, ছেলে-বুড়ো আসতো তাদের তাপিত ব্যথিত মন নিয়ে; আসতো অশান্ত মনে অসংখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ফরিয়াদ জানাতে, মনের শান্তি ফিরে পেতে। এই দরগার সঙ্গে রয়েছে জেলার প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায়। এই বটগাছ ছিল শতাব্দীর সাক্ষী অজস্র পাখির আশ্রয়।

দরগার প্রান্তে বসে কতজনে অঝোরে কেঁদেছে চোখের পানি দিয়ে মনের গ্লানি ধুয়েমুছে ফেলার জন্য, কেঁদেছে অন্ধকার ভবিষ্যতে আলোর ইশারা পাবার জন্য। আশা পূর্ণ হবে কি অপূর্ণ থাকবে তা না ভেবে তৃপ্ত মন নিয়ে দরগা থেকে ফিরে গেছে সবাই। কতজনে মানত করেছে, সন্তান পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবজাতককে নিয়ে যাবে দরগায়, বাবা ফরিদের চরণধূলিমাখা দরগার মাটি লেপে দেবে তার কপালে। কতজন আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে দরগায় জ্বেলে দিয়েছে রঙিন মোমবাতি। শিরনি বিতরণ করছে পালাপার্বণে, উৎসব-আনন্দে নতুন কাজের শুভারম্ভে। শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ সব রাত মুখরিত থাকতো লোকের আনা-গোনায়; মিলাদ মাহফিল, জিকির আর মোনাজাতে, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী, গজল, নাত, হামদ গাইতো সুকণ্ঠ গায়করা। এখানে আসতো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই। কেউ কাউকে কোনো দিন বাধা দেয়নি। একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ছিল দরগার অলিখিত নিয়ম। দরগার কোনো রক্ষক ছিল না, দরগার উন্নতির জন্য কারো কাছে কেউ হাত পাততো না, দরগাটি ছিল পার্থিব সব সমস্যার ঊর্ধ্বে।

চেল্লার ইতিহাস

চেল্লাটির গায়ে উৎকীর্ণ লেখা থেকে জানা যায়, ১৩০০ সালে সাকরগঞ্জের জনৈক পনির উদ্দিন চেল্লাটি তৈরি করে দিয়েছে। স্থানটি ছিল উন্মুক্ত ও বট গাছের ছায়াঢাকা। বিভিন্ন পুঁথি-পুস্তক থেকে জানা যায়, মুসলিম ধর্ম প্রচারক শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন বা ফরিদ শাহ্ বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যদের এই স্থানটিতে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতেন এবং শিষ্যদের আধ্যাত্মিক মার্গে দীক্ষা দিতেন এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি নিজেও এখানেই ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁর জ্ঞানের আলোকে বহু বিধর্মী ইসলামের সত্য ও শান্তির পথ দেখতে পেয়েছিল।

১৮৫০ সালে যশোর জেলার কিয়দংশ এবং ঢাকা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত নতুন জেলার নামকরণ করা হয়। এই বিশিষ্ট মুসলমান সাধক ফরিদ শাহের নাম অনুসারে ফরিদপুর। ফরিদ শাহের দরগার পাদপ্রান্তে গড়ে ওঠে শহর ফরিদপুর। গড়ে ওঠে দালান-কোঠা, হাটবাজার, কোর্টকাছারি, স্কুল-কলেজ। একবার পদ্মা নদীর তীর ভাঙতে ভাঙতে দরগাটির অতি কাছে চলে আসে। পদ্মার ভাঙন দেখে সবার মনেই বিষাদের ছায়া নেমে আসে। তবে কি দরগা নদীগর্ভে চলে যাবে, আর কি দেখা যাবে না দরগাটিকে? হাজার মানুষ মুনাজাত করলো আল্লার দরবারে, ফরিয়াদ জানালো দরগাটিকে রক্ষা করতে। ফরিয়াদ তাদের মঞ্জুর হয়েছিল-পদ্মার খরস্রোত স্তিমিত হয়ে গেল, নদী চলে গেল দরগা থেকে ১০-১২ মাইল দূরে। এই নামের ওপর ছিল মানুষের বিশ্বাস।

আর দেখা যাবে না

ফরিদ শাহের এই চেল্লা এবং বুড়ো বটগাছটিকে আজ আর কেউ দেখতে পাবে না। জেলার ইতিহাসের, ইসলাম ধর্ম প্রসারের এক নীরব সাক্ষীকে কেটে ফেলা হয়েছে কিছুদিন আগে। রুদ্ধ হয়ে গেছে সেখানে সব শ্রেণীর লোকের অবাধে আসা-যাওয়ার স্বাধীনতা। আজ সেখানে তৈরি হচ্ছে একটি মাদ্রাসার জন্য দালান। যে উদ্দেশ্যেই এই কাজের পেছনে থাকুক না কেন, এর জন্য জনসাধারণের এক অংশের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাদের কথা হলো, 'বাবা ফরিদ ইচ্ছা করলে ওখানে তো ইমারত তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে যেতে পারতেনই। কে জানে তিনি ওই স্থানটিকে শান্ত সুশীতল ছায়াঘেরা অনাড়ম্বর উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন কি না! কিন্তু

চেল্লা ও বটগাছটির মর্যাদা ধর্মভীরু মানুষের কাছে অপরিসীম। যারা ধর্মকে নিজস্ব ধারায় প্রয়োজনে ব্যবহার করে তারাই এ কাজটি করেছে।

আগুন জ্বলেছিল

বটগাছটি কেটে ফেলার সময় গাছটির মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। এটা কোনো ভুতুড়ে গল্প নয়। এটাও জনশ্রুতি। মানুষের দেখা বাস্তব ঘটনা। ভয়ে কাঠুরেরা কুড়াল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী গাছটির সে আগুন নিভিয়ে ফেললেও যে খ্রিস্টান কন্ট্রাক্টর গাছটি কাটার দায়িত্ব নিয়েছিল, বেশ কিছুদিন দুরারোগ্য রোগে ভুগে সে মারা যায়। মৃত নরেন সাহা বলেছিল, তার এই দুঃসাহস ঠিক হয়নি, ব্যাপারটাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। গাছটি কাটার উনিশ দিনের মধ্যে ফরিদপুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে। এগুলো এখন কিংবদন্তির ন্যায় সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। যে শকুনের জন্য হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা হয়েছিল কে জানতো সে ওই বটগাছটিতে বসবাসকারী শকুনদেরই একটি ছিল কি না। এটা চালু কাহিনী। দরগাকে কেন্দ্র করে দু-একটি অঘটন আজও ঘটে। বাস্তবাদী মন এ সমস্ত কথায় আমল না দিলেও ভাবপ্রবণ মন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে, মানুষ সব ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতা দূর করতে পারে না।'

সম্প্রতি ফরিদপুরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মাদ্রাসার জন্য নির্মিত ভবনটি এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফরিদপুর জেলা শাখার কার্যালয়। তারা ভাড়া নিয়েছে। অন্যদিকে ভবনের সামনের জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক স্থাপত্য নকশা সমৃদ্ধ মসজিদ ও মাদ্রাসার ৩ তলা ভবন। ভবনসমূহে ঢোকার গেটের পেছনে রয়েছে 'শাহ ফরিদ হাফিজিয়া মাদ্রাসা'র সাইনবোর্ড। গেটের সামনে বা কাছাকাছি অন্য কোনো মাজার, চিল্লা বা আস্তানার সাইনবোর্ড বা পরিচিতিমূলক কিছু নেই। কথা হয় মসজিদের মুয়াজ্জিন কাম ইমাম হাফেজ মোঃ আবুল হোসাইনের সঙ্গে। তিনি জানান, ৬ বছর আগে মসজিদ ও মাদ্রাসার ৩ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনি জানান, আগে এখানে গানবাজনাসহ বিভিন্ন 'বেদাত কাজ' হতো। এখন এসব কাজ বন্ধ। এখন নিয়মিত ওয়াজ মাহফিল হয়। তবে তিনি উল্লেখ করেন, সাধারণ মানুষ এখনো গরু, মুরগী, হাঁস, খাসি, দুধ, শিরনিসহ বিভিন্ন মানত এখানে নিয়ে আসে। তা ইমাম সাহেবের হেফাজতে যায়। এটাতে তিনি আপত্তি করেন না।

কথা হয় ফরিদপুর শহরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক সাংসদ ইমাম উদ্দিন আহমদের সঙ্গে। তিনি জানান, শেখ ফরিদের আস্তানার বটগাছ কাটার সময় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ এসেছিল। তখন দেশে ছিল সামরিক শাসন, আইয়ুবের আমল। প্রতিবাদ করা যেতো না। উদ্যোক্তারা ছিল প্রভাবশালী ও সরকার সমর্থক। তিনি আরো বলেন, যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো না, কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস করতো, তাদের কেন্দ্র ছিল শেখ ফরিদের আস্তানা। মানব ধর্মে বিশ্বাসী ফকির-সন্ন্যাসী সবাই আসতো। এখন সাধারণ মানুষ সেখানে ঢুকতে পারে না। কিন্তু আস্তানা বা চেল্লার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের ফরিদপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক ইমাম উদ্দিন আহমদ বলেন, শেখ ফরিদের দরগায় ছিল সাধারণ মানুষের শান্তি খোঁজার একটি আশ্রয়স্থল। ষাটের দশকে গাছ কাটার মাধ্যমে সেই পরিবেশকে বদলে দেয়া হয়েছে। এও আরেক রাজনীতি। ধর্মকে এক নেতা রাজনীতিতে ব্যবহার শুরু করেছে।

অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন তার গ্রন্থে এবং ইমাম উদ্দিন আহমদ সাক্ষাৎকারে ষাটের দশকে ফরিদপুরে শেখ ফরিদের আস্তানায় পরিবেশ বদলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তার প্রবন্ধে এর আগের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। 'ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ 'ওহাবী' আন্দোলনের ফলে এখন 'শেখ ফরিদ' প্রমুখ পীরদের মর্যাদা কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক দরগাহ লুপ্ত এবং অনেক দরগাহ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।'

ব্রিটিশ আমলে ঢাকা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় নতুন জেলা ফরিদপুর। সেই ফরিদপুরে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, প্রত্যেকেই শেখ ফরিদ সম্পর্কিত এক বা একাধিক মিথ জানেন। ফরিদপুর সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার অফিসে বসে কথা হয় শহরের সংস্কৃতি কর্মী ও কয়েকজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে। তারা বলেন, ফরিদপুরের সাধারণ মানুষ শেখ ফরিদের ভক্ত। মানুষ এখনো আশ্রয় প্রার্থনা করে শেখ ফরিদের কাছে।

> আজ থেকে ৫০ বছর আগে শেখ ফরিদের চশমাকে চট্টগ্রাম শহর থেকে ১ মাইল উত্তরে বলে চিহ্নিত করা হতো। পাহাড়ের চূড়ায় ছিল একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। গাছের নিচে ছিল একটি কালো পাথর। পাথরে পায়ের ছাপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী, শেখ ফরিদ এই পাথরে একপায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করেছিলেন। পাহাড়টি শহরবাসীর কাছে পরিচিত ছিল চশমা হিল নামে। পাহাড়ের পাদদেশে ছিল ঝরনা। ঝরনার পাশে ছিল ছোট একটি পুকুর

শেখ ফরিদের চশমা :
পাহাড়ের এক পুণ্য ঝরনাধারা

আজ থেকে ৫০ বছর আগে শেখ ফরিদের চশমাকে চট্টগ্রাম শহর থেকে ১ মাইল উত্তরে বলে চিহ্নিত করা হতো। পাহাড়ের চূড়ায় ছিল একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। গাছের নিচে ছিল একটি কালো পাথর। পাথরে পায়ের ছাপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী, শেখ ফরিদ এই পাথরে একপায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করেছিলেন। পাহাড়টি শহরবাসীর কাছে পরিচিত ছিল চশমা হিল নামে। পাহাড়ের পাদদেশে ছিল ঝরনা। ঝরনার পাশে ছিল ছোট একটি পুকুর। তেঁতুল গাছ, ঝরনা, পাথর জড়িয়ে আছে শেখ ফরিদের সাধনা জীবনের কাহিনী। চট্টগ্রামবাসীর মুখে মুখে প্রচলিত এই কাহিনী। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে আছে 'শেখ 'ফরিদের চশমা' নিবন্ধটি। তিনি লেখেন 'বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, চট্টগ্রামের পবিত্র দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর মধ্যে 'শেখ ফরিদের চশমা'ও অন্যতম। ইহার পবিত্রতা অর্জন সম্বন্ধে আশৈশব অনেকের মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছি। শুনিয়া চিন্তা করিয়া ফেলিয়াছি, একই গল্পের নানা রঙ নানাভাবে নানামুখে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।' নিবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করেন প্রচলিত উপাখ্যান।

'শেখ ফরিদ একজন মস্ত বড় দরবেশ ছিলেন। অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া পুণ্যশীলা মাতার যত্নেই তিনি প্রতিপালিত হইতেছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিয়া ফরিদ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলে একদা তাঁহার পুণ্যবতী জননী পুত্রকে বলিলেন, 'বাবা ব্যবহারিক শাস্ত্রে মহাজ্ঞানী হইয়াছ বটে, এ পর্যন্ত পরমার্থ জ্ঞান (কীটদষ্ট) দেখিলে না; পরকালে তোমার কি গতি হইবে?' এই কথা শুনিয়া আবার শেখ ফরিদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ক্রমেই পরমার্থ জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অতঃপর একদা ফরিদ মাতার অনুমতিক্রমে পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন এবং দ্বাদশ বৎসর তথায় সাধনা করিবার

পর গৃহে ফিরিয়া মাতাকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করেন। মাতা দ্বার খুলিয়া পুত্রকে দেখামাত্র তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন, ‘লক্ষ্মীছাড়া, এখনও তোমাকে দ্বার খুলিয়াই ঘরে আনিতে হয়; তুমি আমার পুত্র নও; এখনও তোমার কামেলিয়ৎ (সিদ্ধত্ব) লাভ হয় নাই; ভালো চাও তো গৃহে ফিরিও না।’ মাতার নিকট হইতে এহেন কঠোর তিরস্কার লাভ করিয়া ফরিদ আর গৃহে ফিরিলেন না; তিনি আবার বনে চলিয়া গেলেন এবং আরও দ্বাদশ বৎসর সাধনা করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এইবারও দ্বার স্বতঃই উন্মুক্ত হইল না। তিনি মাতার নিকট হইতে পূর্ববৎ কঠোর তিরস্কার লাভ করিলেন। তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, হয় মাতৃ ইচ্ছা অনুরূপ সিদ্ধত্ব লাভ করিবেন, নতুবা জীবন বিসর্জন দিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিবেন।

ফরিদ তৃতীয়বার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং বনে গিয়া জগৎ ভুলিয়া কঠোর তপশ্চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, চট্টগ্রামের যেই স্থানে ‘শেখ ফরিদের চশমা’ বর্তমান রহিয়াছে, সেই স্থানেই পর্বত হতে লম্বমান একটি বৃক্ষের ডালে পা দুইটি বাঁধিয়া নিচের দিকে মস্তক স্থাপন পূর্বক শেখ ফরিদ আল্লাহর পবিত্র নাম ধ্যান করিতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই তিনি কেবল অহরাত্র ধ্যানে নিমগ্ন। দুঃখে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়াছে, বেদনায় তাঁহার শরীর জর্জরিত হইয়াছে, অকৃতকার্যতার বেদনায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, তবু তিনি এ কঠোর তপশ্চারণ পরিত্যাগ করিলেন না। এ সময়ে তাঁহার নয়নযুগল হইতে শুধু নীরবে অবিরল ধারে অশ্রু ও রক্তপাত হইতেছিল। এইরূপে তিনি আরও দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর শুষ্ক কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার সাধনা টলিল না, নয়ন হইতে অশ্রু ও রক্তধারাপাতের অবসান হইল না। সুদীর্ঘ বার বৎসর পর তাঁহার শরীরের কোথাও একবিন্দু রস ও একটুকু মাংস অবশিষ্ট রহিল না।

ঠিক এমন সময় এক ক্ষুধার্ত কাক ঐ বৃক্ষের ডালে বসিয়া তাহার নিকট আহার্য প্রার্থনা করিল। ফরিদ তাঁহার সমস্ত শরীর এই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে দান করিলেন। কাক তাঁহার শরীরের যাবতীয় অংশে একে একে চঞ্চু বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায়, ফরীদ তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া অনুযোগ জানাইল। ফরিদ অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে তাঁহার বাম চক্ষুটি আহার করিতে কাককে অনুরোধ করিলেন। কাক তাহা আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উড়িয়া গেল। ফরীদ এক চক্ষু হারাইয়া আবার আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার একটি কাক আসিয়া পূর্ববৎ আহার্য প্রার্থনা করিল। ফরিদ এইবার প্রথমেই বলিলেন, ‘আমার নিকট আহারের উপযোগী আর কিছুই নাই; দয়া করিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি আহার করিয়া যাও।’ কাক তাহাই করিল। চক্ষু দুইটি সমুৎপাটিত হইবামাত্র ফরিদ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দিব্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি সপ্ততল আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইতেছেন।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে গিয়ে দেখা যায়, আমূল বদলে গেছে চট্টগ্রামের শেখ ফরিদের চশমার পরিবেশ। চশমা হিল এলাকাটি এখন সিটি কর্পোরেশনের ষোলশহর ওয়ার্ড এলাকায়। শহরের ২নং রেলগেটের পাশে। বিখ্যাত সেই তেঁতুল গাছটি এখন আর নেই। কেটে ফেলা হয়েছে। চশমা হিলের মাটি কেটে তৈরি করা হয়েছে আবাসিক এলাকা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, চশমা হিলের জায়গা প্লট হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং সেখানে শতাধিক পাকা ভবন নির্মিত হয়েছে

অতঃপর ফরিদ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সিদ্ধাত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং গৃহে প্রত্যাগমন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তিনি বাড়ি ফিরিয়ে দেখিলেন, গৃহদ্বার আপনিই খুলিয়া গেল। তাঁহার মাতা বুঝিতে পারিলেন, সত্যিই তাঁহার পুত্র এইবার সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গৃহে আনিলেন। বহুদিন পর মাতা-পুত্রের পুনর্মিলন হইল।

বলা হইয়া থাকে, শেখ ফরিদ যখন পা দুইটি বৃক্ষের ডালে বাঁধিয়া কঠোর তপশ্চারণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে যে অশ্রু ও শোণিতপাত হইতো তাহা হইতেই আধুনিক ‘শেখ ফরিদের চশমা’র উৎপত্তি হইয়াছে।’

এটাকে ড. হকও প্রচলিত কিংবদন্তী হিসেবেই নিয়েছেন।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে গিয়ে দেখা যায়, আমূল বদলে গেছে চট্টগ্রামের শেখ ফরিদের চশমার পরিবেশ। চশমা হিল এলাকাটি এখন সিটি কর্পোরেশনের ষোলশহর ওয়ার্ড এলাকায়। শহরের ২নং রেলগেটের পাশে। বিখ্যাত সেই তেঁতুল গাছটি এখন আর নেই। কেটে ফেলা হয়েছে। চশমা হিলের মাটি কেটে তৈরি করা হয়েছে আবাসিক এলাকা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, চশমা হিলের জায়গা প্লট হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং সেখানে শতাধিক পাকা ভবন নির্মিত হয়েছে। এলাকাটির নাম রাখা হয়েছে ‘চশমা হিল আবাসিক এলাকা’। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ৮/১০ বছরের মধ্যে এই আবাসিক এলাকাটি গড়ে উঠেছে।

পরিবর্তন আরো আছে। পাহাড়ের পাদদেশে চশমা কূপ বা ঝরনার এলাকায়ও পরিবর্তন এসেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে সুদৃশ্য মসজিদ, ঈদগা, কূপ ভবন, অফিস ভবন ইত্যাদি। ভরাট করে ফেলা হয়েছে পুকুর। কথা হয় শেখ ফরিদ চশমা জামে মসজিদের সহকারী ইমাম হাফেজ মোঃ রায়হানের সঙ্গে। ১৯৯৮ সালে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, আগে ছোট মসজিদ ছিল, ৪ কাতারে নামাজ পড়া যেতো। এখন পুকুর ভরাট করে সেখানে বারান্দা দিয়ে মসজিদ বাড়ানোর ফলে ২৬ কাতারে নামাজ পড়া যায়। তিনি আরো জানান, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কূপ দিয়ে প্রচুর পানি আসতো। এরপর পানি আসার পরিমাণ খুব কমে গেছে।

মসজিদের অপর সহকারী ইমাম মওলানা আবু তাহের জানান, ১০ বছর আগে এখানে প্রায়ই গানবাজনা হতো, কাওয়ালী হতো। এখন হয় না। এখন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার মিলাদ, জিকির ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরো জানান, আগে প্রতি বছর ২৯ মাঘ এখানে বাৎসরিক উৎসব হতো।

‘শেখ ফরিদ (রঃ) চশমা মসজিদ কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটি’ এখন পুণ্যস্থানটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অধীনে এই পরিচালনা কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং সাধারণ সম্পাদক পিডিবির প্রকৌশলী আলহাজ মোঃ আবু নাসের। রয়েছে ইমামসহ ৬ জন স্টাফ।

সরজমিনে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ভক্তিসহ আসেন শেখ ফরিদের চশমায়। সেখানে কথা হয় রাউজানের পাহাড়তলী থেকে আসা মিনা দাসের (৩০) সঙ্গে। মিনা দাস এসেছেন তার শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, যার চোখ দিয়ে কয়েক দিন ধরে জল পড়ছে। মিনা দাসের সঙ্গে তার ভাই হারাধন দাসও ছিল। মিনা দাস জানান, মাগুর গাছ মানত ছিল। মাছ দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, তাদের এলাকার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই এখানে আসেন।

কথা হয় চট্টগ্রামের একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত তরুণ চিকিৎসক ফাতেমা সুইটির সঙ্গে। পিতার চাকরির সূত্রে তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে চট্টগ্রামে। ডা. ফাতেমা সুইটি জানান, ছোটবেলায় তিনি অনেকবার শেখ ফরিদের চশমায় গিয়েছিলেন। গিয়েছেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। তাদের বাসায় বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আত্মীয়রা এলেই যেতেন শেখ ফরিদের চশমায়। তার মতে, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালীসহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষের কাছে শেখ ফরিদের চশমা একটি পুণ্যস্থান, তীর্থস্থান। তীর্থস্থান দর্শন করতে মানুষ সেখানে যায়।

> ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল নিকটবর্তী ভবেরপাড়ায় যা বর্তমানে মুজিবনগর নামে পরিচিত, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। বাগোয়ান আগে মেহেরপুর সদর থানার অধীন ছিল, এখন মুজিবনগর থানায়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রাম বাগোয়ানে বাজার আছে, ছোট। তেমন বিকাশ লাভ করেনি। ফলে বাগোয়ান এখন গ্রাম। বাজবাড়ি ছিল, দুর্গ ছিল। ছিল বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য। সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে শুধু শেখ ফরিদের আস্তানা

শেখ ফরিদের আস্তানা ও একটি প্রাচীন জনপদের কথা

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জনপদ চট্টগ্রাম। ফরিদপুরে জনবসতি গড়ে উঠেছে বেশ আগে। দু'টি জনপদে শেখ ফরিদের স্মারক স্থানদ্বয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলাদেশের আরো একটি প্রাচীন জনপদে আছে শেখ ফরিদের আস্তানা। মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বাগোয়ানে।

শ ম শওকত আলীর লেখা 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থে বাগোয়ান গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়, 'মেহেরপুরের বাগোয়ান একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। মোঘল সম্রাট আকবরের সময় এখানে নৌঘাঁটি ছিল। বাগোয়ান পরগণা সে সময় নানা রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী। এই গ্রামে নদীয়া বাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দের বাড়ি ছিল। অন্নদা মঙ্গলের কবি ভরতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) তার কাজে বাগোয়ান গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। মীরজা নাথের বাহিরিস্তানই সায়েরী গ্রন্থেও বাগোয়ান গ্রামের উল্লেখ আছে। রেনেলের ম্যাপে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বাগোয়ান-এর নাম আছে।'

মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আমিনুল ইসলামের লেখা 'মেহেরপুরের ইতিহাস' গ্রন্থেও বাগোয়ানের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, 'বাগোয়ান গ্রামের সন্নিকট দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী বহুকালের ইতিহাস বুকে নিয়ে আজো প্রবহমান। মধ্যযুগের নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব ছিল অন্যতম। ভৈরব নদী দিয়েই নৌকা পথে ইসলামের ঝান্ডাবাহক পীর খান জাহান আলী গৌড় থেকে বারোবাজার হয়ে বাঘের হাটে গিয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য রাজা মানসিংহ ১৫৮৯ সালের দিকে জলাঙ্গী বা খড়ে অর্থাৎ ভৈরব নদী পার হয়ে বাগোয়ানে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতে গমন করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে লিখেছেন-

"মজুন্দার সংগে রঙ্গে খ'ড়ে পার হয়ে
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে।"

অন্যস্থানে কবি লিখেছেন :

"ধন্য ধন্য পরগনা বাগোয়ান গ্রাম
গাঙ্গিনীর পূর্বকুলে আন্দুলিয়া গ্রাম
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম
যাহে অন্নদার দাস হরিহোর নাম।"

এছাড়া, ১৭৫০ সালে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ শিকার করার উপলক্ষে ভৈরব নদী পথে বাগোয়ানে আসার প্রাক্কালে তিনি এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হন। বাধ্য হয়ে তাঁর পরিষদসহ আমদহের রাজু ঘোষানীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

বাগোয়ান গ্রামের পুরাতন নাম ছিল মাহাদপুর বাগোয়ান। মোগল ইসলাম খান যশোরের হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধ্বংস করার জন্য গিয়াস খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মোগল সেনাপতি গিয়াস খান বাগোয়ানে তৎকালীন সময়ে অবস্থিত মোগল সেনা ঘাঁটিতে আগমন করেন। এ বিষয়ে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সাহেবের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের (৩০ থেকে ৩১) পাতায় বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।'

ইতিহাসে আরো একটি বড় ঘটনা ঘটে বাগোয়ান গ্রামের পাশেই। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল নিকটবর্তী ভবেরপাড়ায় যা বর্তমানে মুজিবনগর নামে পরিচিত, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। বাগোয়ান আগে মেহেরপুর সদর থানার অধীন ছিল, এখন মুজিবনগর থানায়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রাম বাগোয়ানে বাজার আছে, ছোট। তেমন বিকাশ লাভ করেনি। ফলে বাগোয়ান এখন গ্রাম। বাজবাড়ি ছিল, দুর্গ ছিল। ছিল বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য। সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে শুধু শেখ ফরিদের আস্তানা।

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম তার 'মেহেরপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন, 'মেহেরপুরের সর্বাধিক প্রাচীনতম জনপদ হচ্ছে বাগোয়ান। মেহেরপুর শহরে জনবসতি স্থাপনের বহুপূর্বে বাগোয়ান গ্রাম জনপদ গড়ে উঠে। মেহেরপুর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে দক্ষিণে অবস্থিত বাগোয়ান গ্রামের পূর্ব দক্ষিণ দিকে শেখ ফরিদের দরগা শরীফ বিদ্যমান। দরগাটি অত্যন্ত পুরাতন। বর্তমানে একটি কমিটি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। দরগার পাদদেশে দুটি কালোপাথর রয়েছে এবং বেশকিছু টেরাকোটা ছোট ছোট মাপের ইট আজো রয়েছে। পাথর ও ইট দৃশ্যে অনুমান করা যায়, বাগেরহাটের দরবেশ খান জহান আলীর দরগাহের সমসাময়িক।'

বাগোয়ানে সরেজমিনকালে দেখা যায়, আস্তানার চারদিক নিচু দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় মাঝখানে একটি প্রাচীন ভবনের ধ্বংসাবশেষ। এর মধ্যে বেড়ে উঠেছে বিভিন্ন বৃক্ষ। বাগোয়ান গ্রামে বিভিন্ন বয়সী মানুষের সঙ্গে কথা হয়। তারা সবাই ভবনের উৎপত্তি এবং গ্রামে রাতের বেলায় বাগোয়ান গ্রামে কাক অবস্থান না করার বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এক রাতে শেখ ফরিদের আস্তানায় গায়েবীভাবে ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কথা ছিল, এক রাতের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু রাতের বেলায় এক পর্যায়ে কাক ডেকে ওঠে। বন্ধ হয়ে যায় ভবন নির্মাণ। অসমাপ্ত থাকে ভবন। স্থানীয় জনসাধারণের মতে, এই ঘটনার পর কাক রাতের বেলায় বাগোয়ান গ্রামে থাকে না বা থাকতে পারে না। তাদের মতে, দিনের বেলায় কাক দেখা যায়, কিন্তু রাত হলেই তারা আর গ্রামে থাকে না। গ্রাম ত্যাগ করে।

সেই অসমাপ্ত ভবনের ভাঙা কাঠামো ও স্তূপকৃত ইট এখনো আছে। এর সামনে ছিল সারিবদ্ধভাবে সাজানো ৭টি কালো পাথর। গত দু'বছর আগে ক্ষমতাসীন একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা শরিয়ত বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে পাথরগুলো ইটের স্তূপের ওপর বেড়ে ওঠা গাছের ঝোপের ভেতর রেখে দেয়। পরে অবশ্য

একটি পাথর আবার সামনে এনে রাখা হয়েছে।

সরেজমিনকালে, ভক্তদের আস্তানায় এসে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায়। দেখা যায়, আস্তানায় দলবেঁধে নারীরা এসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। স্থানীয় যুবক মোঃ পিলটন এ প্রসঙ্গে বলেন, হিন্দু, মুসলমান, হিন্দু খ্রিস্টান সবাই এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসে। জামাতে ইসলামীর নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রদ্ধা জানায় না শুধু তারা। তারা বলে এখানে শরিয়ত বিরোধী কাজ হয়।

দরগাপাড়ার ইসমাইল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, মানুষ খাসি, মুরগি, চাল, ডালসহ বিভিন্ন মানত নিয়ে এখানে আসে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন গ্রামে ঈদের পৃথক পৃথক জামাত হয়। কিন্তু বাগোয়ান গ্রামে কখনো ভিন্ন জামাত হয়নি। কখনো কখনো বিরোধ হয়েছে। কিন্তু জামাতের আগে সবাই শেখ ফরিদের আস্তানায় চলে আসতো জামাতে শরীক হতো।

একটি ঈদগাহ'র কাঠামো আছে। এর সামনে বেশ খোলা প্রান্তর। এরপর গায়েবী ভবনের স্তূপ। চারপাশে আম, নারিকেল, আতাফল, গাব, বরুন, ডুমুর, মেহগনিসহ বিভিন্ন ফল, ফুল ও ঔষধি বৃক্ষ আছে আস্তানায়। একটি বড় তেঁতুল গাছ ছিল। জনশ্রুতি, এখানেই বসতেন বাবা শেখ ফরিদ। বড় তেঁতুল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। ৬/৭ বছর আগে তেতুল গাছসহ বেশ কিছু গাছ কেটে চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। গত বছর আরো কিছু গাছ কেটে গেট নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গাছ কাটার ব্যাপারে স্থানীয় ভক্তরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

কথা হয় শেখ ফরিদের আস্তানার খাদেমের সঙ্গে। তিনি জানান, পুরুষানুক্রমিকভাবে তারা খাদেমের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তার পূর্ব পুরুষদের কাছে জেনেছিল, বাবা শেখ ফরিদ এখানে এসে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, এখানে সাধারণ মানুষ আসেন, পাগল ফকির সাধুরাও আসেন।

শেখ ফরিদের আস্তানা : ঢাকায় ও দিনাজপুরে

দিনাজপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন মেহরাব আলী। তার 'দিনাজপুরে ইসলাম' গ্রন্থে এসেছে শেখ ফরিদের কথা। গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, 'দিনাজপুর শহর আগত অন্যতম প্রভাবশালী অগ্রগন্য পীর দরবেশগণের মধ্যে পুন্যাত্মা শেখ ফরিদের নাম খুবই জনপ্রিয়। শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ঘাঘরা নদীর তীরে একটি প্রাচীন গোরস্থানের মধ্যস্থলে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। এক মাত্র প্রবাদ ও প্রচলিত বিশ্বাসের উৎস ছাড়া এই পীরেরও সঠিক ঐতিহাসিক পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁর মাযারে কাল নির্দেশক কোনো ফলক পাওয়া যায়নি এবং মাযার সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদেরও নিদর্শন এখানে অনুপস্থিত। তবে পীরের পুণ্যময় নামের সূত্রে যে মৌজাটির নাম ফরিদপুর হয়েছে এই প্রবাদধৃত সূত্রটি স্থানীয় সবাই অবগত।

এমনো মতবাদ রয়েছে যে, যে সাধক ফরিদের নামানুসারে ফরিদপুর জেলার নামোৎপত্তি হয়েছে, সেই একই সাধক ছিলেন দিনাজপুর শহরে আগত ইসলাম প্রচারক পীর শেখ ফরিদও। কিন্তু এ ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার মূলে সঙ্গত ঐতিহাসিক কারণ আছে কিনা বলার উপায় খুব কম।

দিনাজপুর রাজ-জমিদারীর গোড়াপত্তনের সঙ্গে ইসলাম প্রচারক শেখ ফরিদের ঘটনা জড়িয়ে আছে বলে কিংবদন্তী বিদ্যমান। জানা যায় যে, যুগল রাজত্বকালের মধ্যমাংশে যখন রাজবংশের উৎপত্তি হয় এবং সে সূত্রে দিনাজপুর শহরাঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠে, সে সময় ইসলাম প্রচারোদ্দেশ্যে সশিষ্য পীর শেখ ফরিদ এই স্থানে আগমন করেন। তখন শহরাঞ্চলটি বনজঙ্গলপূর্ণ ছিল, জনবসতি ছিল বিরল এবং অমুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগুরু। এমন অবস্থায় একজন নবাগত পীরের নাম শুনে বহু ভক্ত মুসলমান পরিবার শহরে আগমন করে, বিভিন্ন মহল্লার অধিবাসী হয় এবং পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অভিজ্ঞ মহলের অভিমতে এই সূত্রেই শহরে মুসলমান জনবসতি শুরু হয়। তার পূর্বে নবস্থাপিত শহরটিতে হিন্দু অদিবাসী ছাড়া কোনো মুসলমানই ছিল না।

ইংরেজ শাসনামলে সুদীর্ঘকাল জঙ্গলবৃত্ত থাকার পর পাকিস্তানি আমলের শুরুর দিকে স্থানীয় মাযার ভক্ত মুসলমান জনসাধাণ দ্বারা শেখ ফরিদের কবরখানা জঙ্গলমুক্ত করা হয় এবং মাযার যিয়ারত প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হয়। বহু পূর্বকাল থেকে এই পবিত্র গোরস্থানে সমাধি লাভ পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে বিশ্বাসটি মুসলমান সাধারণের মধ্যে বিশ্রুত থাকায় পীরের মাযারের প্রতি লোকের ভক্তি ও আকর্ষণ বেড়ে যায়। বিস্মৃত প্রায় পীরের মাযারটি ভক্ত সমাগম দ্বারা জাগ্রত কবরখানায় পরিণত হয়।

ইদানীং গোরস্থানটির উন্নতি সাধন করা হয়েছে। গোরস্থানের সংলগ্ন একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এবং বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পীরের উরস উদযাপনের প্রথাও প্রবর্তিত হয়েছে।'

> সরেজমিনকালে, ভক্তদের আস্তানায় এসে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায়। দেখা যায়, আস্তানায় দলবেঁধে নারীরা এসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। স্থানীয় যুবক মোঃ পিলটন এ প্রসঙ্গে বলেন, হিন্দু, মুসলমান, হিন্দু খ্রিস্টান সবাই এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসে। জামাতে ইসলামীর নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, শ্রদ্ধা জানায় না শুধু তারা। তারা বলে এখানে শরিয়ত বিরোধী কাজ হয়। দরগাপাড়ার ইসমাইল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, মানুষ খাসি, মুরগি, চাল, ডালসহ বিভিন্ন মানত নিয়ে এখানে আসে

চাঁদপুর জেলার একটি থানার নাম ফরিদগঞ্জ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে 'ফরিদগঞ্জ' ভূক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফরিদগঞ্জ থানায় যেসব বিখ্যাত আল্লাহর ওলি ও কামিল ব্যক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে জানা যায় তাঁদের মধ্যে শেখ ফরিদ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে বলা হয় শেখ ফরিদের নাম অনুসারেই ফরিদগঞ্জ নাম হয়েছে।

এ নিয়ে বিরোধও আছে। ইসলামী বিশ্বকোষে এ সম্পর্কে বলা হয়, 'একটি মতে ফরিদ আলী নামে একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর নাম অনুসারে এই স্থানটির নামকরণ হয়। অন্য মতে তৎকালীন রূপসার প্রভাবশালী জমিদারের তনয়া ফরিদা বানু'র নাম অনুসারে এই স্থানটির নামকরণ করা হয়। তবে ফরিদগঞ্জে শেখ ফরিদের আসার তথ্য জানা গেলেও তাঁর আস্তানা আছে কিনা এ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে আছে শেখ ফরিদের আস্তানা। প্রকৃতি প্রেমিক বিপ্রদাস বড়ুয়া শেখ ফরিদের এই আস্তানাটিকে দেখেছেন বৃক্ষপ্রেমিকের চোখে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বিপ্রদাশ বড়ুয়ার' 'গাছপালা তরুলতা' গ্রন্থের 'পিত্তরাজ বেল ফুল' শীর্ষক অংশে উল্লেখ করা হয়, 'একটি বড় পিত্তরাজ আছে কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে শেখ ফরিদের মাজারে ওপর। ছত্রাকার ঘন ছায়াদার গাছটি দূর থেকে যে কোনো প্রকৃতি প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। নিবিড় সবুজ

> ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন বাংলাদেশে শেখ ফরিদের পরিভ্রমনকে। শেখ ফরিদ সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসবিদরা। বিশ্লেষণ করেছেন সাক্ষ্য প্রমাণও। শেখ ফরিদকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস। গড়ে উঠেছে ইসলামী দৃষ্টি। শিখ দৃষ্টিতে লেখা ইতিহাস। আছে উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন উৎস। শেখ ফরিদ মুলতানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্ম সন নিয়ে মতান্তর আছে

গাছটির সঙ্গে উত্তর দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে ডুমুর গাছের দুটি শাখা। সেই শাখায় ডুমুর ফল ধরে আছে- কয়েকটি সবুজ কয়েকটি লাল। ভাদ্র মাস বলে ডুমুর প্রায় শেষ হতে চলেছে। বেশ বড়, লালগুলো রসালো হবে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সব সময় লক্ষ্য করি। সঙ্গে কেউ থাকলে চিনিয়ে দেই। আর মাজারের পুবমুখী মূল দরোজার দক্ষিণ ঘেঁষে ভেতর থেকে বেরিয়েছে বেল ফুলের লতা। সাত-আটটি মোটা লতার গোড়া মাজারের ভেতরে। ছাদের ঠিক নিচে একটা ফোকর করে পাতাসহ গাছটি বের করে দিয়েছে। ফুলও ফুটে আছে কয়েকটা। এটি লতা বেল। বোটানিক্যাল নাম (Jasminum heyneana Wall. ফ্যামিলি Oleaceae । ফুলে অনেকগুলো পাপড়ি। ভারি সুন্দর তিনটি গাছসহ মাজার। মাজার, মন্দির, গির্জা ও বিহারে এরকম গাছপালা সচরাচর দেখা মেলে।

বাবা শেখ ফরিদের মাজার কর্তৃপক্ষকে মনে মনে সাধুবাদ দিলাম। প্রকৃতি-প্রেমিক না হলে তাঁরা তিনটি গাছ এভাবে রক্ষা করতেন না। ঘরের ভেতরে কবরের উত্তর পাশে পিত্তরাজ ও যজ্ঞ ডুমুর গাছটির গোড়া। আনুমানিক শতবর্ষ ওদের বয়স। যজ্ঞ ডুমুর গাছটির গোড়ার একটি ডাল নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও পাকা ছাদ ফুটো করে গাছ দুটিকে রক্ষা করা হয়েছে। মাজার একতলা দালানের। অনুমান করি বৃক্ষ প্রেমিক ছিলেন বাবা শেখ ফরিদ। তিনি যদি গাছ ভালো না বাসতেন তার মুরিদরা এই ঐতিহ্য কোথায় শিখতেন। অনেক মানুষ মাজার ও মন্দির-মসজিদ-গির্জায় যান কিন্তু বৃক্ষ- প্রেমের ও মানব প্রেমের দীক্ষা নেন কি?

গাছের নিচে একটি কবর আছে। কার কবর এ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আস্তানায় ১৯৫০ সালে নির্মাণ করা হয়েছে 'ফরিদিয়া জামে মসজিদ'। আস্তানা ও মসজিদের পাশেই ফুটপাত। ব্যস্ত সড়ক। কিন্তু সরজমিনে কালে দেখা গেছে, সাধু ফকিররা ব্যস্ত ফুটপাতে বসেই শ্রদ্ধা জানায় বাবা শেখ ফরিদের প্রতি আসেন সাধারণ মানুষরাও। আসেন বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তরা।

ইতিহাসের শেখ ফরিদ, কিংবদন্তীর শেখ ফরিদ

মহানায়কদের নিয়ে কিংবদন্তীর শেষ নেই, আর ইতিহাসবিদদের মধ্যে বাড়ে বিরোধ।

ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন বাংলাদেশে শেখ ফরিদের পরিভ্রমনকে। শেখ ফরিদ সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসবিদরা। বিশ্লেষণ করেছেন সাক্ষ্য প্রমাণও। শেখ ফরিদকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস। গড়ে উঠেছে ইসলামী দৃষ্টি। শিখ দৃষ্টিতে লেখা ইতিহাস। আছে উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন উৎস।

শেখ ফরিদ মুলতানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্ম সন নিয়ে মতান্তর আছে। বঙ্গে (স্বূফী প্রভাব গ্রন্থে ড. এনামুল হক উল্লেখ করেছেন ১১৭৬ সাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে, ১১৭৭। ইসলামী বিশ্বকোষে সম্পর্কে বলা হয়, তাঁহার জন্মের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিরমানী, সিয়ারুল আওয়লিয়া, পৃ ৯৪, ৫৬৯/১১৭৩-১১৭৪ সনে এবং তারিখ-ই ফিরিশতা, (বারগিস, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ, ২খ ৭২৫) গ্রন্থে ৫৮৪/১১৮৮ সন উল্লিখিত আছে। অনুরূপ মতভেদ মৃত্যুর সন সম্পর্কেও পরিদৃষ্ট হয়। কিরমানী উল্লেখ করেন, এই তারিখ হইল, ৫ মুহাররাম ৬৬৪/১৭ অক্টোবর ১২৬৫ সনে (সোমবার) এবং তারিখ-ই ফিরিশতা (বোম্বাই, ২খ, ৭৩৯) গ্রন্থে ৫ মুহাররাম, ৬৭০/১৩ আগস্ট, ১২৭১ সন (বৃহস্পতিবার) বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শকর মানে চিনি আর গঞ্জ মানে শহর। নামের সঙ্গে শকরগঞ্জ বা গঞ্জেশকর যুক্ত হওয়ার পেছনে রয়েছে একটি উপাখ্যান। শেখ ফরিদের পূর্ব পুরুষগণ বিভিন্ন রাজ দরবারে কাজীর পদে চাকরি করেছেন। ছোটবেলায় তার বাবা মারা যান। গড়ে ওঠেন মায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর ওপর মায়ের প্রভাব ব্যাপক। মোবারক করীম জওহরের লেখা 'ভারতের সুফি' গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঘটনাটি।

'ইসলামের বিধান অনুযায়ী সাত বছর বয়স থেকে ছেলে- মেয়েদের নামাজে অভ্যাস করানো পিতা-মাতার কর্তব্য। ফরিদের মাও এ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি প্রতিদিন প্রতি নামাজের ওয়াক্তে বালক ফরিদকে নামাজ পড়ানোর জন্য নিজের হাতে জায়নামাজ বিছিয়ে দিয়ে তার নিচে এক পুরিয়া চিনি রেখে দিয়ে বলতেন: বাবা, যে ছেলে নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তার জায়নামাজের নিচে চিনি থাকে। তুমি যদি নিয়মিত নামাজ পড়, তবে তুমিও চিনি পাবে।

চিনির লোভে বালক ফরিদ নিয়মিত নামাজ পড়তে লাগলেন। কোনোদিন কোনো কারণেই তিনি নামাজ কামাই করতেন না।

একদিনের ঘটনা। কর্মব্যস্ততাবশত ফরিদের মা একদিন জায়নামাজের নিচে চিনি রাখতে ভুলে গেলেন। পরে যখন মনে পড়ল তখন নামাজের সময় অতিক্রান্ত। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। একটু পরে ছেলেকে সামনে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : বাবা,

আজ নামাজ পড়েছ কি?

ফরিদ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মা, আজ আমি নিজেই জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়েছি এবং চিনিও পেয়েছি। এই দেখুন চিনির পুরিয়া।

চিনির পুরিয়া দেখে মা অবাক বিস্ময়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ছেলের জন্য এই চিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সাশ্রুনেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দোয়া করলেন: পরোয়ার দেগার! আমার ফরিদকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। তুমি তাকে কবুল কর এবং নূরে ঈমানীর আলোকে তার অন্তর আলোকিত কর।

মায়ের এই দোয়া কবুল হয়েছিল। বালক ফরিদ কালক্রমে যুগ শ্রেষ্ঠ ওলির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। চিনির পুরিয়া পাওয়ার পর থেকে মা তাকে শকরগঞ্জ বলে ডাকতেন। মায়ের দেওয়া এই নামেই তিনি সারা জীবন পরিচিত ছিলেন। সকলেই তাকে বাবা গঞ্জেশকর বলে অভিহিত করতেন।'

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ 'ফারীদুন্দ- দীন গানজ্ ই- শাকার ভূক্তিতে বলা হয়, মুলতানের এক মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় মাওলানা মিনহাজু'দ-দীন তিরমিযীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সেই খানেই তিনি পনর কিংবা আঠার বৎসর বয়সে খাজা কুত বুদদীন বাখতিয়ার কাকী (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং চিশ্‌তিয়াপন্থী সুফিদের অন্তর্ভুক্ত হন। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কিছুকাল কান্দাহারে অবস্থান করেন। সেইখান হইতে তিনি বাগদাদ, ইরান এবং বুখারা শহরেও গমন করেন ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ সুফীগণ হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। উহাদের মধ্যে নিম্মোল্লিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য: শিহাবুদ দীন সুহরাওয়ার্দী (ম. ৬৩২/১২৩৪ সন) সা'দু'দ দীন হামাবী আওহাদুদ দীন কিরামানী (মৃ. ৬৩৫/১২৩৭), ফারীদু'দ দীন আততার নিশাপুরী (ম. ৬২৭/১২) শায়খ সায়ফু'দ দীন বাখিরযী (ম. ৬৫৮/১২৫৯) বাহাউ'দ-দীন যাকারিয়্যা মুলতানী (ম. ৬৬৪/১২৬৬)।

চিশতীয়া তরিকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান। নতুন যুগ নির্মাণের দায়িত্ব পান শেখ ফরিদ। ভারতে নতুন যুগের সুচনার সক্রিয় ছিলেন চিশতীয়া তরিকার সুফিরা নতুন সভ্যতার বিকাশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ভারতে চিশতীয়া তরিকার ভিত্তি স্থাপন করেন খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'বঙ্গে স্বূফি প্রভাব' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়।

অজমেরের (সং, অজয়মেরু) ভারতবিখ্যাত সাধক খব্‌াজহ্‌ মুঈন-দ্‌-দীন (আঃ স্বাহ্বিব) ভারতবর্ষে চিশ্‌তীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে সন্‌জিরসতানে (আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি জেলা) তাহার জন্ম হয়; সিদ্ধত্ব লাভের পর, ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে একান্ন বছর বয়সে তিনি দিল্লী হইয়া অজমেরে গমন করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তখন অজমেরাধিপতি পৃথীরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। কথিত আছে এই বিবাদের ফলে, চিশ্‌তী সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, অচিরেই রাজা পৃথীরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেক দিন হইতে রাজা পৃথ্বীরাজের সহিত সুলত্বান মুহম্মদ ঘূরীর (১১৮৯-১২০৫) বিবাদ ও যুদ্ধ চলিতেছিল। সুলতান কয়েকবার অজমেরাধিপতির নিকট পরাজিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। চিশ্‌তী সাহেবের অজমের আগমণের পর ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে সুলত্বান মুহ্বমদ ঘুরীর হস্তে রাজা পৃথ্বীরাজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলেন সাধক প্রকৃতই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকিলে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার ভারত আগমনে হিন্দুর স্বাধীনতা সূর্য্য ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল; আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধিকারের বীজ স্থায়ীভাবে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে যদি প্রসিদ্ধি লাভ করে, চিশ্‌তী সাহবের ভারত আগমনও ততোধিক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। চিশ্‌তী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূরণার্থে অথবা দেবদোষে ঘটনাক্রমে যে রূপেই হউক চিশ্‌তী সাহেবের আগমনের পরই যখন তিরৌরীতে পৃথ্বীরাজের পতন হয়।'

খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী ভারতবাসীর জন্যে রেখে যান নতুন নিশান। তাঁর মৃত্যুর পর ১২৩৬ সালের ১৮ মার্চ নিশান এগিয়ে নেয়ার নেতৃত্বর দায়িত্বে আসেন প্রধান খলিফা খাজা বখতিয়ার কাকী। খাজা বখতিয়ার কাকী নশ্বর দেহ ত্যাগ করায় দায়িত্ব আসে শেখ ফরিদের ওপর। মানুষকে আলো দেখানোর দায়িত্ব পাঞ্জাবের আজুদহনে যিনি তার স্থায়ী মানকা স্থাপন করেন। সেখানে অবস্থান করেই তিনি সারা ভারতে ইসলাম বিস্তার নেতৃত্ব দেন। পরিভ্রমণ করেন ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিশাল ভুভাগ

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করতে হয় ইসলামী রাজশক্তির আগেই সুফিবাদ প্রচারিত হয় এবং মানুষ সুফিবাদে অনুরক্ত হয়।

খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী ভারতবাসীর জন্যে রেখে যান নতুন নিশান। তাঁর মৃত্যুর পর ১২৩৬ সালের ১৮ মার্চ নিশান এগিয়ে নেয়ার নেতৃত্বর দায়িত্বে আসেন প্রধান খলিফা খাজা বখতিয়ার কাকী। খাজা বখতিয়ার কাকী নশ্বর দেহ ত্যাগ করায় দায়িত্ব আসে শেখ ফরিদের ওপর। মানুষকে আলো দেখানোর দায়িত্ব পাঞ্জাবের আজুদহনে যিনি তার স্থায়ী মানকা স্থাপন করেন। সেখানে অবস্থান করেই তিনি সারা ভারতে ইসলাম বিস্তার নেতৃত্ব দেন। পরিভ্রমণ করেন ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিশাল ভুভাগ।

আজুদহন সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বকোষে লেখা হয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষ যথাযোগী, কালোপোশাকধারী দরবেশ, হিন্দু, মুসলমান, গ্রাম ও শহরবাসী সকলেই তাঁহার নিকট আসিত। ফলে তাহার দরবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কেন্দ্রে উন্নত হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় কতিপয় ধর্মীয় অনুশাসনের সুপারিশ করিয়া তিনি কতিপয় স্থানীয় উপভাষা উন্নয়নের সাহায্য করেন'।

শেখ ফরিদ মৃত্যুবরণ করেন আজুদহনে, মুহরম মাসের ৫ তারিখে। তবে সাল দিয়ে মতান্তর আছে। কেউ বলেন, ১২৬৫ কেউ বলেন ১২৬৬ আবার কেউ বলেন ১২৭১। সমাহিত করা হয় আজুদহনেই। শেখ ফরিদের প্রভাবে জায়গাটির নাম ক্রমশ পাল্টে যায়। পরিচিত হয় পাকপত্তন নামে। পাক মানে পবিত্র আর পত্তন মানে ভূমি। বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি শহর থেকে পাকপত্তন।

উত্তরকালে শেষ ফরিদ

নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন শেখ ফরিদ। কিন্তু ভারতে নতুন সংস্কৃতি নির্মাণে শিষ্যদের মাধ্যমে তিনি যেন আরো বেশি সক্রিয়। সংস্কৃত বা ফার্সি তখন রাজভাষা। রাজভাষা ছাড়া কবি সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করেন না। সাধারণ মানুষের ভাষা থাকে উপেক্ষিত। শেখ ফরিদ কবিতা রচনা করে আঞ্চলিক ভাষায়। শিখ উপাসলয় গুরুদুয়ারা নামকশাহী ঢাকার প্রধান গ্রনসি এবং রাগি ভাই পিয়ারা সিং জানান, শিখ ধর্মগ্রন্থ, 'গ্রন্থসাহেব' এ শেখ ফরিদের দুইশত থেকে আড়াইশত শ্লোক বা দোহা বা কবিতা আছে। এসব সঙ্গীত পাঞ্জাবী গুরুমুখী ভাষায়। তিনি আরো বলেন, শেখ ফরিদ মুসলামন ছিলেন বা হিন্দু ছিলেন বা শিখ ছিলেন এই হিসেবে

তাকে মানা হয় না, শিখ ধর্মাবলম্বীরা তাকে খুব বড় একজন ভক্ত হিসেবে মান্য করে।

গুরু নানক জন্মেছিলেন ১৪৬৯ সালে। ৩০ বছর বয়সে গৃহ ও চাকরি ত্যাগ করে ফকির হয়ে যান। ‘ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব’ গ্রন্থে গৃহতাগ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ড. তারা চাঁদ লেখেন, কিংবদন্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে নানক তার পরবর্তী ৪০ বছরের জীবনের চার চার বার ভ্রমণকালে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইরান, আরবের সব গুরুত্বপূর্ণ নগর ও পবিত্র স্থান পরিদর্শন করেন। পানিপথের শেখ শরফ, মুলতানের পীরগণ, পাক পত্তনের বাবা শেখ ফরিদের উত্তরাধিকারী শেখ ব্রাহম (ইব্রাহিম) ও অন্যান্যের সঙ্গে তার দীর্ঘ বাক্যালাপ হয়। উল্লখিত সুফিদের মাধ্যমে শেখ ফরিদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শিখ ধর্ম গ্রহন করে।

ভারতে সাধনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮)। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে কবীরের ভূমিকা অসামান্য। শেখ ফরিদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার কবীর। ‘বঙ্গে স্বূফি প্রভাব’ গ্রন্থে ড. মুহম্মদ এনামুল হক লেখেন, ‘কবীরকে সাধারণত রামানন্দের শিষ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন। কিন্তু তিনি প্রধানত চিশতীরই সম্প্রদায় ভুক্ত সাধক ছিলেন। এক দিকে রামানন্দ যেমন তাহার গুরু ছিলেন, তেমনই শয়খ থকী সুবহররর্দী তাহার ‘মুরশিদ’ (গুরু) ছিলেন। ... ইহার পর শয়খ ভীকা চিশতীর নিকট হইতে মিরকহ-ই খিলাফত’ যা আধ্যাত্ম উত্তরাধিকারীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং নতুন মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করে ন’।

কবীর প্রথম হিন্দি ভাষায় গান লিখে তার বাণী প্রচার করেন। পরবর্তীতে দাদু মীরা তুলসিদাসে প্রমুখ হিন্দি ভাষায় কবিতা লিখে বিকাশ ঘটান হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের। শেখ ফরিদের অনুসারীরা বাংলা ভাষায় বিকাশ লাভে ভূমিকা রাখেন। বস্তুত ১৪ শতকের পর হিন্দি, পাঞ্জাবিসহ উত্তর ভারতীয় ভাষাসমূহ বিকাশে শেখ ফরিদের অনুসারীদের মূল ভূমিকায় থাকেন।

চিশতীয়া খানকাগুলোতে সঙ্গীতের চর্চা হতো। শেখ ফরিদ নিজে গান শিখতেন। শেখ ফরিদের প্রধান খলিফা ছিলেন খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন আমীর খসরু। আমীর খসরুর হাতেই বর্তমান উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিলো। খন্দকার আবদুর রহমানের লেখা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ ‘আমীর খসরু’তে আছে মহরম মাসের পঞ্চম দিনে খাজা ফরিদের মাজার শরিফে যখন ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হতো তখন আমীর খসরু সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।’

কবি, দর্শনিক, ঐতিহাসিক আমীর খসরু সঙ্গীতেও অনন্য। তিনি প্রবর্তন করেন কাওয়ালি গান। আবিষ্কার করেন বাদ্যযন্ত্র ‘সেতার’। পাখোয়াজ নামক বাদ্যযন্ত্রটি দু’ভাগ করে তিনি সৃষ্টি করেন ‘তবলা’ ও ‘বয়া’। পারস্য সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের মিলন ঘটিয়ে প্রবর্তন করেন নতুন গীতরীতি। সাত রকমের তাল তারই আবিষ্কার। সৃষ্টি করেন অসংখ্য রাগরাগিনী। আমীর খসরুর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছে অনুযায়ী সমাহিত করা হয় নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে।

শেখ ফরিদের মৃত্যুর পর চিশতীয়া তরিকার প্রধান সংগঠকের দায়িত্বে আসেন প্রধান খলিফা নিজামউদ্দিন আউলিয়া। দিল্লিতে ছিলো তার খানকা, যা এখন মাজার হিসেবে পরিচিত। খাজা মঈনদ্দিন চিশতী ভারতে চিশতীয়া তরিকার ভিত্তি স্থাপন করেন। শেখ ফরিদ সারা ভারত ভ্রমণ করে ছড়িয়ে দেন চিশতীয়া তরিকার আলো। নিজামউদ্দিন আউলিয়া সারা ভারতে গড়ে তোলেন মজবুত ভিত্তি। আর বিপুলসংখ্যক খলিফাকে প্রেরণ করেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বাংলাদেশে প্রেরণ করেন শেখ আখি সিরাজ উদ্দিনকে। বোরহানউদ্দিন গরিবকে নিযুক্ত করেন দাক্ষিণাত্তে। দেওগারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খানকা। শেখ ইয়াকুবকে পাঠান গুজরাট এলাকায়। পরে সেখানে আরো যান শেখ হুসাম উদ্দিন সুলতানী, শেখ সাঈদ হোসেন ও শেখ বারক উল্লাহ।

১৩ শতকের আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন এমন সুফির সংখ্যা খুবই কম। মূলত ১৩ শতকের পর থেকে দলবেঁধে সুফিরা বাংলাদেশে আসতে থাকেন। তারা কোন পথে কিভাবে এসেছিলেন এ সম্পর্কিত তথ্য প্রায় পাওয়া যায় না। তবে হযরত শাহজালাল সিলেটে আসার সময় দিল্লির একটি ঘটনার কথা জানা যায় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ প্রকাশিত সৈয়দ মর্তুজা আলীর হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস’ গ্রন্থে। গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আসার সময় দিল্লিতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে হযরত শাহজালালের সাক্ষাৎ হয়েছিলো এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার আস্তানায় তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। এ সময় নিজামউদ্দিন আউলিয়া ২টি কবুতর উপহার দেন হযরত শাহজালালকে। হযরত শাহজালাল কবুতর সিলেটে নিয়ে এসেছিলেন, যা বর্তমানে জালালী কবুতর নামে পরিচিত। এই কবুতর দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারেও দেখা যায়।

তথ্য প্রমাণ তেমন নেই। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। ১৩ শতকের পর সুফিরা এমন দলবেঁধে বাংলাদেশে আসছেন, তারা কি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি দেশে এসেছিলেন নাকি আসার আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসতেন? বাংলাদেশের প্রচলিত জনশ্রুত অনুযায়ী, শেখ ফরিদ বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। শেখ ফরিদ কি তার প্রধান খলিফা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন? আসার সময় সুফিরা কি দিল্লি থেকে ধারণা নিয়ে আসতেন? এরকম আরো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন পানিপথের শাহ বুয়ালিকলন্দর। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কলন্দরিয়া তরিকা। কলন্দররা আল্লার প্রেমে উন্মাদ। তারা সাধারণত পাগলের বেশে থাকেন। কলন্দর ফকিররা এক সময় সারা বাংলাদেশে ছাড়িয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গে স্বূফি প্রভাব গ্রন্থে ড. মুহম্মদ এনামুল হক উল্লেখ করেন, ‘এই যে বাঙ্গালাদেশে উত্তর-ভারতীয় ‘ক্বলন্দর’ আখ্যাধারী দর্‌বীশ্‌দের আগমন, তাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিলো বলিয়া মনে হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ‘ক্বলন্দরেরা’ বাঙ্গালাদেশে যে পঙ্গপালের ন্যায় ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই সময়ে সংখ্যাধিকভাবে তাহাদের বঙ্গাগমনে এবং অবিরাম কম্মতৎপরতায় মুগ্ধ হইয়াই বাঙ্গালার হিন্দু-সুমলমান ‘ক্বলন্দর’ শব্দ ব্যবহারের দ্বারা যে কোনো শ্রেণীর দরবীশ্‌কে বুঝাইতেন- যেন

চিশতীয়া খানকাগুলোতে সঙ্গীতের চর্চা হতো। শেখ ফরিদ নিজে গান শিখতেন। শেখ ফরিদের প্রধান খলিফা ছিলেন খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন আমীর খসরু। আমীর খসরুর হাতেই বর্তমান উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিলো। খন্দকার আবদুর রহমানের লেখা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ ‘আমীর খসরু’তে আছে মহরম মাসের পঞ্চম দিনে খাজা ফরিদের মাজার শরিফে যখন ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হতো তখন আমীর খসরু সঙ্গীত পরিবেশন করতেন’

‘ক্বলন্দরেরাই’ একমাত্র মুসলমান সাধকদল, যেন তাহারাই সকল শ্রেণীর সুফি প্রচারকদের প্রতিনিধিস্থানীয়। বাঙ্গালী যে এই সময়ে ‘ক্বলন্দর’ শব্দ দ্বারা সকল শ্রেণীর সুফি প্রচারককে বুঝাইতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মধ্যযুগীয় (১৪০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণকে এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিরূপে ধরা হইয়া থাকে; তিনি ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাহার সুপ্রসিদ্ধ ‘চন্ডী’ কাব্যে ‘কলন্দর’ শব্দ দ্বারাই মুসলমান সাধকদিগকে বুঝান হইয়াছে, যেমন

‘ঋণ কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর।’
অথবা
‘কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।’

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরাও যে কলন্দর বা ‘ক্বলন্দর’ শব্দ দ্বারা সকল শ্রেণীর সুফিকে ও মুসলমান সাধককে বুঝাইতে তাহার প্রমাণ চট্টগ্রাম হইতে আরবি অক্ষরে অনুলিখিত ‘যোগ কলন্দর’ নামক কতকগুলো বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার। এই বাঙ্গালা পুঁথিগুলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। সুফিদের সাধনা পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের যোগ পদ্ধতির সংমিশ্রণে এই পুঁথিগুলি রচিত হইয়াছিলো।’

শেখ আখি সিরাজউদ্দিনকে খলিফা করে বাংলায় পাঠান নিজামউদ্দিন আউলিয়া। আসার সময় নিজামউদ্দিন আউলিয়া তাঁকে বেশকিছু গ্রন্থ দিয়েছিলেন। গৌড়ে আখি সিরাজউদ্দিনের খানকায় একটি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ আমি সিরাজউদ্দিন (মৃত্যু ১৩৫৮) থেকে বাংলায় চিশতীয় তরিকার লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। গৌড়কে কেন্দ্র করে তিনি প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে রিয়াজুস সালাতিনে উল্লেখ আছে। গৌড়ের তৎকালীন মহাপন্ডিত শেখ আলাউদ্দিন আলাউল হক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেখ আলাউল হকের পর বাংলায় চিশতীয়া তরিকার নেতৃত্বে আসেন শেখ নূর কুতুবুল আলম। রাজনৈতিক ভূমিকার কারণেও কুতুবুল আলম আলোচিত। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ‘বঙ্গে স্বূফি প্রভাব’ গ্রন্থে লেখেন, ‘রাজা গনেশর অভ্যুত্থানে বাঙ্গালার এমন মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি টলিয়া গিয়েছিলো, এমন রাষ্ট্রনীতিবিশারদ কুত্বব-ই-আলম এদেশে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি নতুন করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন।’

শেখ ফরিদের অনুসারীরা বাংলায় ইসলাম বিস্তারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দোভাষী পুঁথিতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। বাংলার মানুষের কাছে আদরণীয় পুজনীয় হয়েছেন চিশতী ফকিররা। সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চিশতীয়া ফকিরদের অসংখ্য খানকা মাজার। শেখ ফরিদ আছেন বাংলায় শেখ ফরিদ আছেন ভারতে, শেখ ফরিদ আছেন পাকিস্তানে, শেখ ফরিদ আছেন জগৎময়।

শেখ ফরিদকে নিয়ে বাংলাদেশের দৈনিকগুলোতে সংবাদ বের হয়েছিলো ২০০১ সালের ২ এপ্রিল। এপি এবং এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছিলো, ‘পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে এক পীরের মাজারে পদদলিত ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কমপক্ষে ৪০ জন ভক্ত নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছে। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে পাকপত্তনে ১৩ শতাব্দীর বাবা ফরিদগঞ্জেস্করের মাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে

পাকিস্তান ও ভারতের জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে শেখ ফরিদের গানের ক্যাসেট ও সিডি পাওয়া যায়। ইন্টারনেটেও ক্রয় করা যায় এসব ক্যাসেট ও সিডি। শেখ ফরিদ লিখে গোগলের ইঞ্জিনে সার্চ করলে শেখ ফরিদের ওপর ১০ হাজারের বেশি ওয়েবসাইটের নাম চলে আসে। তবে এর মধ্যে শিখ ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্মাণ করা সাইটের সংখ্যাই বেশি।

শেখ ফরিদকে নিয়ে ওয়েবসাইট, সিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি প্রকাশ করা হলেও পত্রিকার পাতায় শেখ ফরিদ আসেন কম। এসেছিলো দু’বছর আগে এক সংবাদ। চট্টগ্রামের শেখ ফরিদের চশমা জামে মসজিদের হাফেজ মোঃ রায়হান বলেন, পাক পত্তনের বাবা শেখ ফরিদ বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে সাধনা করেন। গত দু’বছর আগে পাক পত্তনের ওরসের সময় দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করেন মোঃ রায়হান। শেখ ফরিদকে নিয়ে বাংলাদেশের দৈনিকগুলোতে সংবাদ বের হয়েছিলো ২০০১ সালের ২ এপ্রিল। এপি এবং এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছিলো, ‘পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে এক পীরের মাজারে পদদলিত ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কমপক্ষে ৪০ জন ভক্ত নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছে। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে পাকপত্তনে ১৩ শতাব্দীর বাবা ফরিদগঞ্জেস্করের মাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার বাবা ফরিদগঞ্জেস্করের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ১ লাখ ভক্ত মাজার জিয়ারত করতে যান। ওই মাজারে বেহেশতি দরজা বলে একটি গেট আছে। শনিবার মাঝরাতে প্রার্থনা শেষে হাজার হাজার ভক্ত ওই দরজার সামনে জড়ো হয়। কিন্তু মাজার তদারককারীরা গেট খুলতে প্রায় ৩ ঘন্টা বিলম্ব করে। এতে দরজার সামনে ভিড় জমে যায় এবং বাইরেও লম্বা লাইন পড়ে যায়। এক সময় দরজা খুললে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।’

না, এই দুর্ঘনার সংবাদটি ছাড়া শেখ ফরিদকে নিয়ে আর কোনো সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ বাংলাদেশের পত্রিকায় ছাপা হতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের ধর্ম, রাজনীতি ও সাহিত্যের লিখিত ইতিহাসে খোঁজ করার চেষ্টা হয়েছে। সেখানেও শেখ ফরিদ প্রসঙ্গ এসেছে খুবই কম। ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সবাই স্বীকার করেন শেখ ফরিদকে নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কাজ হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষিতদের লেখায়, গানে আসেনি শেখ ফরিদ প্রসঙ্গ। যা পাওয়া তা মূলত লোকগাথা বা কিংবদন্তি।

বাংলাদেশে শেখ ফরিদ : ঐতিহ্য ও ইতিহাস

সাধারণ মানুষের মধ্যে আছেন শেখ ফরিদ। আছেন লোক সাহিত্যে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোক সাহিত্য পূর্ববঙ্গ ‘গীতিকার’ নূরুন্নেছা ও কবরের কথা’ শীর্ষক গীতিকায় আছে,

‘তার পাছে মানি আমি ফকির শেখ ফরিদ,
নিজাম উলিয়া মানম তান সাহারিদ।’

কাহিনী শুরুর আগে কবি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। শেখ ফরিদকে নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সময়ে রচনা করেছেন সাহিত্য। ছাত্র ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানান, তার বরিশালের নানাবাড়িতে একজন হুজুর বাস করতেন। হুজুর সুর করে গাইতেন,

‘ফজর পড়িয়া ফরিদ ভাবে মনে মনে
রুটি পানি খাব আমি যোহরেরও পানে
যোহর পড়িয়া ফরিদ ভাবে মনে মনে
রুটি পানি খাব আমি আসরের পানে
আসর পড়িয়া ফরিদ ভাবে মনে মনে,
........’

শেখ ফরিদের ৩৬ বছরের সাধনা জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা কবিতা। ফিরোজ আহমদ আরো জানান, হুজুর শেখ ফরিদকে নিয়ে লেখা এই গান সুর করে গাইতেন এবং গানের শেষে

বিস্তারিতভাবে শেখ ফরিদের সাধনা জীবন নিয়ে বলতেন।

ড. মুহম্মদ এনামুলের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ময়মনসিংহে ‘শেখ ফরিদের পুঁথি’ নামে দো-ভাষী বাংলার একটি পুঁথি বটতলার ছাপখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদ ড. গৌতম ভদ্র জানিয়েছেন, তার কাছে ‘শেখ ফরিদ সম্পর্কিত একটি পুঁথি আছে। পুঁথি হয়তো আরো লেখা হয়েছে। খোঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে একটি পাখি আছে নাম শেখ ফরিদ। বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম ২০০২ সালের অক্টোবরে আয়োজন করেছিল ‘শেখ ফরিদ পাখির ওপর আলোচনা সভা’। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট প্রাণী বিজ্ঞানী ড. রেজা আলী খান।

প্রকৃতিতে আছেন, কবিতায় আছেন, গানে আছেন, গল্পগাথায় আছেন। সব জায়গায় আছেন শেখ ফরিদ। সারা দেশে প্রচলিত শত শত কিংবদন্তির মধ্যে আছেন শেখ ফরিদ। আছেন ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিরোধেও।

> বাংলায় তখন অনেক রাজ্য, অনেক রাজধানী। এ অবস্থা চলে দীর্ঘদিন। হোসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সারা বাংলাদেশ একটি শাসন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৫১৯) পর্যন্ত গড়ে ৭ বছর করে ৪২ জন শাসক গৌড় শাসন করেন

শেখ ফরিদের সময়ে বাংলা ছিল বড় অস্থির। বাংলায় তখন ছিল ক্রান্তিকাল। শেখ ফরিদের সময়কাল ছিল ১১৭৬/৭৭ থেকে ১২৬৯-৭১ পর্যন্ত। এই সময় বাংলার সমাজ জীবন আমূল বদলে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিল। ১২০২/৪/৫/৬ সালে বখতিয়ার খিলজি বিনা রক্তপাতে নদীয়া দখল করেন। এ প্রসঙ্গে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ‘ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়, ‘বৃদ্ধ রাজা বখতিয়ার খিলজিকে কোনো রূপ বাধা না দিয়েই রাজধানী থেকে পালিয়ে এসে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। এরপরও তিনি আরো দু’বছর কাল রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে যে সমস্ত ভূমি দান করা হয়, তার অধিকাংশই হয়েছিল ঢাকার বিক্রমপুর থেকে। বিভিন্ন আবিষ্কৃত লিপি থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণ সেনের পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ঢাকার বিক্রমপুর থেকে অন্তত ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভূমিদান করে গেছেন।’

বাংলায় তখন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। গড়ে ওঠে ছোট ছোট রাজা। সৈয়দ আমিরুল ইসলাম তাঁর ‘বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস’ গ্রন্থ লেখেন’ সুন্দরবন অঞ্চলের খাড়িমণ্ডলে মহারাজধিরাজ দোমনপাল স্বাধীন হয়েছিলেন ১১৯৬তেই, অথচ এটি বোধকরি বিজয় সেনের আমল থেকেই সেন অধিকারে ছিল। ত্রিপুরা-কুমিল্লা অঞ্চলে পট্টিকেরা বেশ শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদের এখানে অন্তত ১২০৪ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন।

এদিকে মেঘনার পূর্ব পাড়ে দামোদার দেব স্বাধীন নরপতি হিসেবে ১২৩০ থেকে ’৪৩ পর্যন্ত কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে রাজত্ব করছিলেন বলে জানা যায়, এর পূর্ব পুরুষরা (পুরুষোত্তর, তাঁর পুত্র মধুমথন দেব, তাঁর পুত্র বাসুদেবের দামোদর) যদি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন তাহলে তা লক্ষ্মণ সেনের আমল অবধি অবশ্যই গড়ায়। তাম্রলিপিতে মধুমথন দেবকে কেবল রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দামোদর দেবকেই ‘সকল ভূপতি চক্রবর্তী’ বলা হয়েছে। সেনদের মতো তিনি উপাধি নেন ‘অরিরাজ দনুজ-মাধব’। এঁরা ছিলেন বিষ্ণু উপাসক।

সিলেটের ভাতেরা অঞ্চলে আবার কেশব দেব ও ঈশান দেব নামের দু’জন রাজার খবর পাওয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলে দশরথ দেব নামের একজন শাসক দেখা যায়। সমতট অঞ্চলে পাওয়া যায় বীরধর দেব নামের আর এক রাজা। এভাবেই কয়েকটি দেবযুক্ত রাজ-রাজার খবর পাওয়ায় মনে হতে পারে এরা সবাই একই বংশের ছিলেন, যদিও পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় আজো সম্ভব হয়নি।

গয়ার আশপাশের অঞ্চল ঘিরে পৃথ্বী নামে একটি রাজ্য এ সময় বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বুদ্ধ সেন ও তাঁর পুত্র জয় সেন এখানে রাজত্ব করছিলেন। সম্ভবত ১২০০-র দিকে সেন আধিপত্য ছিন্ন করে এই রাজ্য স্বাধীন হয়। অন্তত ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এরা রাজত্ব করেছিলেন, তবে হয়তো তখন তুর্কিদের আধিপত্য স্বীকার করে।

মুঙ্গের জেলার জয়পুর (আধুনিক জয়নগর)-এর রাজা হিসেবে পাওয়া যায় শিব-উপাসক সংগ্রাম গুপ্ত ও তাঁর পূর্বপুরুষদের। সংগ্রামের উপাধি ছিল ‘পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর’।

উপরের তথ্যাদি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় লক্ষ্মণ সেনের আমলেই তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙন।’

বাংলায় তখন অনেক রাজ্য, অনেক রাজধানী। এ অবস্থা চলে দীর্ঘদিন। হোসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সারা বাংলাদেশ একটি শাসন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি (১২০৪) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৫১৯) পর্যন্ত গড়ে ৭ বছর করে ৪২ জন শাসক গৌড় শাসন করেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার ‘বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব গ্রন্থের ‘ইতিহাসের ধারার বাঙলা ও বাঙালি’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, হোসেন শাহী আমল বাঙলার সংস্কৃতিক জীবনের স্বর্ণযুগ। এ সময় বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে বাঙালির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠলো। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।’

হোসেন শাহী আমলে রচিত সাহিত্যের প্রচুর নির্দশন পাওয়া যায়। সেন-পাল আমলের বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু নির্দশনও গবেষকরা পেয়েছেন। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ের তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না এ নিয়ে এখনো নানা মত দিয়ে চলছেন গবেষকরা।

শেখ ফরিদের সময়ে বাংলাদেশ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মুসলিম শাসক ছিলেন হিন্দু শাসকও ছিলেন। তখন শাসকদের মধ্যে লেগে থাকতো যুদ্ধ।

অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন স্বস্তি ছিল না। স্বস্তি এনে দিয়েছিলেন শেখ ফরিদ। বাংলাদেশে প্রচলিত মত অনুযায়ী, শেখ ফরিদ সারা বাংলা ভ্রমণ করে, মানুষকে শেখান প্রেমের বাণী সন্ধান দেন নতুন পথের।

শেখ ফরিদের আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন এ রকম ৬ জন সুফী সাধকের নাম পাওয়ার যায় ইতিহাসে। তাঁরা হচ্ছেন বায়েজিদ বোস্তামি, শাহ সুলতান বলখি, মাহী সাওয়ার, সৈয়দ শাহ সুরুযুল আনাতিয়া, জালালউদ্দিন তাবরেজী, শাহ সুলতান রুমী ও বাবা আদম শহীদ। শেখ ফরিদের সময়কালের পরেই পাল্টে যায় পরিস্থিতি। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে

সুফিরা। দেশের বিভিন্ন শহরে-গঞ্জে এমনকি গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে সুফীদের খানকা।

ঐতিহ্যে আছেন শেখ আছেন শেখ ফরিদ। শেখ ফরিদকে নিয়ে আছে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মত। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, চিশতিয়া তরিকার সুফিদের মধ্যে শেখ ফরিদ বাংলাদেশে প্রথম আসেন। তিনি এক প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন, চট্টগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনে করেন, শেখ ফরিদের চশমা ফার্সি কবি ও সাধক শেখ ফরিদ উদ্দিন আক্তারের স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতরা মনে করেন শেখ ফরিদ শকরগঞ্জ এখানে সাধনা করেছিলেন।

শেখ ফরিদের বাংলায় আগমন আছে বিভিন্ন মত। চট্টগ্রামে বিশেষজ্ঞ আবদুল হক চৌধুরী তার ‘চট্টগ্রাম’ : সমাজ ও সংস্থা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, শেখ ফরিদের চট্টগ্রাম আগমন সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

‘সাব আলটার্ন’ স্টাডিজ পদ্ধতিতে গবেষণা করে খ্যাত পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. গৌতম ভদ্রকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শেখ ফরিদের নাম থেকে ফরিদপুর হয়েছে। কিন্তু এই শেখ ফরিদ যে পাঞ্জাবের শেখ ফরিদ তার কোনো মানে নেই। তিনি আরো বলেন, যে কোনো মুসলমান বর্ধিষ্ণু এলাকায় একজন শেখ চাই। লিজেন্ট চাই। লিজেন্ড ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আস্তানা হয়ে যায়। মোটা দাগে বলতে গেলে, যে কোনো জেলা হলেই যেমন বিশ্ববিদ্যালয় চায় তেমন ব্যাপার।

ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আলেম সমাজের একজন সংগঠককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ফরিদ আরবী শব্দ। এর অর্থ অনন্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একাধিক ফরিদ আছেন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ফরিদ। ফার্সি কবি ও সাধক ফরিদ উদ্দিন আক্তারের লেখা ‘আজকিয়াতুল আউলিয়া’সহ বিভিন্ন গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বে খুব জনপ্রিয়। তাঁর লেখা ‘পন্দেনামা’ এখনো দেশের মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয়। তিনি ষষ্ঠ হিজরি বা খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। এ দেশের আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে তিনি দরবেশ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে বাবা শেখ ফরিদ চিশতীয় তরিকার খুব বড় বড় একজন দরবেশ ছিলেন। বাবা ফরিদের প্রভাব ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত পাঞ্জাবে বেশি। বাংলাদেশে ফরিদ নামে বিভিন্ন দরবেশের নিশান পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও ফরিদ নামটি জনপ্রিয়। সুশাসক হিসেবে খ্যাত শেরশাহ সূরির বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তিনি আরো বলেন, এ দেশে ইসলাম বিস্তারে চিশতিয়া তরিকার খানকাগুলো যে খেদমত করেছে, অন্য কোনো তরিকার ভাগ্যে তা জুটে নাই।

সুফি গবেষক সদরউদ্দিন আহমেদ চিশতীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শেখ ফরিদসহ চিশতীয় তরিকার সুফিরা বাংলায় ইসলাম বিস্তারে মূল ভূমিকা রাখেন। যার জন্য এ দেশের মানুষ শেখ ফরিদকে এত শ্রদ্ধা করে। তিনি আরো বলেন, মুঘল আমলের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সুফিরা ইসলাম বিস্তার ঘটিয়েছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে রাজশক্তির বাধার কারণে সুফিদের তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হয়।

ইতিহাসবিদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের কিউরেটর শামসুল হোসাইনকে বাংলাদেশে শেখ ফরিদের আগমন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শেখ ফরিদের ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের দেশে এখনো ভাল গবেষণা হয়নি। আমরা শুধু ট্রাডিশন রেকর্ড করছি। কিন্তু ঐতিহ্যের ভেতরে যে ইতিহাস থাকে। তা টেনে বের করছি না। ইতিহাসের খুব কম স্কলারই এ নিয়ে কাজ করেছেন। স্থাননাম ইতিহাস বহন করে এ নিয়েও কাজ করার সুযোগ আছে।

বাংলার সুফি বিষয়ে কথা উঠলেই পন্ডিতরা একবাক্যে বলে ওঠেন ড. মুহম্মদ এনামুল হকের কথা। ত্রিশের দশকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ‘এ হিস্ট্রি অব সুফিজম ইন বেঙ্গল’ বিশেষ পিএইচডি করেছিলেন ড. হক। পরবর্তী সারা জীবন তিনি সুফী বিষয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষণা করেছেন শেখ ফরিদ সম্পর্কিত এ দেশে প্রচলিত উপাখ্যান নিয়েও। চট্টগ্রামের ‘অশিক্ষিত’ মানুষের মধ্যে প্রচলিত উপাখ্যান তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। উপাখ্যানটি ইতিপূর্বে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উপাখ্যানের সূত্র ধরে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ‘শেখ ফরিদ চশমা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, ‘চট্টগ্রামের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বিশ্বাস, ইনি পারস্যের প্রখ্যাতনামা সাধক শয়খ্ ফরিদু-দ-দীন অত্বত্বার (মৃত্যু : ১২৩০ খ্রিঃ) ব্যতীত আর কেহ নহেন। তাঁহারা এই বিশ্বাসকে অনুমোদন করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, চট্টগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে আরব ও পারস্যবাসী বণিকের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল; সুতরাং শয়খ ফরীদু-দ-দীন আত্বত্বারের চট্টল আগমনের সম্ভাবনা মিথ্যা নহে। চট্টগ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে, ‘শেখ ফরিদ কে?’ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শুধু একটি বাক্যে তাহার উত্তর দিতে গিয়া বলিয়া থাকে;- ‘শেখ ফরিদ একজন মহাসাধক ও দরবেশে ছিলেন।’ ইত্যধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমাদের উপরোক্ত উপাখ্যানটুকুই বলিয়া দেয়; সুতরাং এদিক হইতে হঠাৎ কোনো সন্ধান লাভ করা যায় না। তাহা হইলে চট্টগ্রামের ‘শেখ ফরিদ’ কি শয়খ ফরীদু-দ-দীন আত্বত্বার? তধ্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া’ এবং তজ্জাতীয় আরও অনেক ফারসি তাপস কাহিনী আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু কোথাও এ যাবত শয়খ ফরীদু-দ-দীন আত্বত্বারের ভারত বা চট্টল বা বঙ্গাগমনের কোনো ইঙ্গিত লাভ করি নাই; সুতরাং এ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন ওঠে, বাবা শায়খ ফরীদু-দ-দীন-গন্‌জ-ই-শকর্ (১১৭৭-১২৭১ বা ১২৬৯ খ্রিঃ) কি কখনও বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? এই পর্যন্ত পশ্চিম ও উত্তর ভারতের তরফ হইতে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাইতে পারি নাই। এ ক্ষেত্রে শুধু উত্তর ভারতীয় প্রমাণকেই কি একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা করিতে যাওয়া ঠিক নহে বলিয়াই মনে হয়; কেননা ভারতীয় সাধকদের কোনো আত্মচরিত নাই। তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে শুধু উত্তর ভারতীয় লৌকিক স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদের জীবনী রচিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ভারতের সুদূর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙ্গালার প্রবাদ বা ঐতিহাসিক ঘটনাটি উত্তর ভারতের সংগৃহীত পুস্তকে স্থান না পাওয়া বা তথা হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়া কি স্বাভাবিক নয়?’

সুফি গবেষক সদরউদ্দিন আহমেদ চিশতীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শেখ ফরিদসহ চিশতীয় তরিকার সুফিরা বাংলায় ইসলাম বিস্তারে মূল ভূমিকা রাখেন। যার জন্য এ দেশের মানুষ শেখ ফরিদকে এত শ্রদ্ধা করে। তিনি আরো বলেন, মুঘল আমলের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সুফিরা ইসলাম বিস্তার ঘটিয়েছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে রাজশক্তির বাধার কারণে সুফিদের তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হয়